গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৪ ডিসেম্বর - ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্রিয়াকলাপ গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করছে

এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, যে কোনও সচেতন ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষই স্বীকার করবেন যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ থেকে শুরু হয়ে, গির্জায় বারবার আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা, সম্প্রতি গো-মাংসের ধুয়া তুলে একজন নিরীহ ব্যক্তির নৃশংস হত্যা, যুক্তিবাদী আন্দোলনের ব্যক্তিত্বদের খুন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যে সকল সংখ্যালঘু অংশের মানুষই ভীত ও আতঙ্কিত বোধ করছেন। এই ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লেখক শিল্পী ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বই তাঁদের প্রতিবাদ স্পষ্ট করতে সরকারি পুরস্কার প্রত্যর্পণ করেছেন। এ অবস্থায় সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের বিরুদ্ধে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল, তখন

প্রসঙ্গ ঃ আমির খানের বিবৃতি

সম্পূর্ণ নীরব থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সংঘ পরিবার ও শিবসেনার মতো সংগঠনকে সুযোগ করে দিয়েছে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের 'ভারতবিরোধী' তকমা দিয়ে তাঁদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে। পরিণামে পরিবেশ-পরিস্থিতির আরও অবনমন ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব সমর্থনে তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতিই আমির খানকে বিবৃতি দিতে প্রণোদিত করেছে এবং ওই বিবৃতিতে আহত সংখ্যালঘু মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। ঐ বিবৃতি থেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এবারও নীরব থেকে কার্যত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সুযোগ করে দিল আমির খানের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ বিষোদগার করার। যা পরিবেশকে আরও কলুষিত করল। এইসব উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডে কলঙ্কিত

৬ ডিসেম্বর কালা দিবস পালন করুন

পাশ ফেল অবিলম্বে চালু করার দাবিতে
ব্যারিকেড ভাঙল ছাত্র-যুবরা

আর টালবাহানা নয়, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে এবং টেট সহ সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ, সকল বেকারের কাজের ব্যবস্থার দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র ডাকে ছাত্র-যুবদের দৃপ্ত মিছিল সশস্ত্র পুলিশের একের পর এক লোহার ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য করল ২৬ নভেম্বর কলকাতায়। পুলিশি আক্রমণে আহত ২০ জন, ৫ জনের আঘাত গুরুতর। (সংবাদ চারের পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীর ৩২ বার বিদেশ সফরে দেশ কী পেল

ক্ষমতায় বসার পর গত ১৭ মাসে প্রধানমন্ত্রী ৩২ বার বিদেশে গিয়েছেন। যা দেখে অনেকে বলতে শুরু করেছেন, তিনি নাকি মাঝে মাঝে এ দেশে আসেন। কিন্তু কেন তাঁর এত বিদেশ ভ্রমণ? প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প তিনি ভারতকে ডিজিটাল বানাবেন, দেশজুড়ে অসংখ্য স্মার্ট সিটি গড়বেন। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প। এ-সবের জন্য পুঁজিপতিদের ধরে আনতেই নাকি তাঁর এই নজিরবিহীন বিদেশ সফর।

প্রধানমন্ত্রীর এই ৩২টি সফরে ফল কী ফলেছে? প্রধানমন্ত্রী যেখানেই গেছেন ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেছেন, প্রবাসী ভারতীয়দের সাথে বৈঠক করছেন। প্রতিটি সভাতেই ফলাও করে বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে দেড় বছরেই তিনি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বদলে ফেলেছেন, উন্নয়নের রথের চাকা কীভাবে এখন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি নাকি তিনি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন, তাঁর ডাকে বিদেশি পুঁজিপতিরা ধেয়ে আসছে এ দেশে বিনিয়োগ করতে।

প্রধানমন্ত্রী প্রচারে যে তুখোড় এবং মস্ত বাক্যবাগীশ তা দেশের মানুষের জানতে বাকি নেই। তাঁর দেদার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভাঁওতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পোড়া মানুষ তাই সহজেই ধরতে পারছেন প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিও কতখানি মিথ্যা। বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। এমন কোনও জিনিস নেই যার দাম লাফ দিয়ে বাড়ছে না। তেলের দাম, ডালের দাম নজিরবিহীন ভাবে বেড়েছে। ওষুধের দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে দাম শুনেই রোগীর হার্টফেল হওয়ার জোগাড়। আর উন্নয়ন? প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আর সরকারি অর্থনীতিবিদদের হিসেবে ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষ আর কোথাও তার দেখা পায়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশি লগ্নি নাকি স্রোতের মতো আসছে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন বলছেন সম্পূর্ণ উল্টো কথা। কয়েকদিন আগেই তিনি বলেছেন, "বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার সব থেকে বড় কারণ শ্লথ লগ্নি। বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ার লক্ষণ নেই। বরং তা কমছে। পূর্ণ ক্ষমতার তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম উৎপাদন হচ্ছে কল-কারখানায়। একই দশা সরকারি লগ্নিরও।" অর্থাৎ বাস্তব পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। পরিস্থিতি বলছে, বিনিয়োগ যতটুকু হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে, তার

দুয়ের পাতায় দেখুন

মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করুন
মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৭ নভেম্বর নিম্নোক্ত চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠান ঃ

আপনি নিশ্চয় লক্ষ করছেন, কী ভয়াবহভাবে রাস্তাঘাটে মাতলামি, মা-বোনদের প্রতি কটূক্তি ও অবমাননা, জুয়ার ঠেক, সাট্টা এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া মদ্যপ অবস্থায় মা-বোনদের প্রতি অশালীন আচরণ, শ্লীলতাহানি এমনকী ধর্ষণেরও ঘটনা ঘটছে, যা আশঙ্কাজনকভাবে এ রাজ্যে বাড়ছে। অতীতে এমন ভয়াবহ আকারে এ ধরনের অসামাজিক ঘটনা ঘটত না, যা পথেঘাটে এখন আকছার ঘটছে। কলকাতার মতো শহরে রাস্তায় সন্ধ্যাবেলায় তো কথাই নেই, দিনের আলোয় এমনকী লালবাজারে পুলিশের সদর দপ্তরের কাছে বড় রাস্তার উপর মদ্যপ অবস্থায় এক কিশোরীর শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর

একের পাতার পর

বেশিরভাগটাই ফাটকা বাজারে, আর যতটুকু হয়েছে তা পুরনো সংস্থার শেয়ারে। বিদেশি লগ্নি নতুন কল-কারখানায় এখনও তেমন কিছু হয়নি।

দেশের আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন কেমন হয়েছে? গত এক বছর ধরে টানা রফতানির পরিমাণ কমে চলেছে। উৎপাদন শিল্পেও দীর্ঘদিন ধরে ভাটা চলছে। গাড়ি কারখানার মতো যেসব ক্ষেত্রগুলি এক সময়ে খানিকটা চাঙ্গা হয়েছিল, সেগুলিতে এখন আবার ছাঁটাই শুরু হয়েছে, শিফট বন্ধ রাখতে হচ্ছে, কোথাও সপ্তাহে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র তিন-চার দিন। ফলে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। হঠাৎ ফুলে ওঠা পরিষেবা ক্ষেত্রকে দেখিয়ে এক সময়ে দেশে কত উন্নয়ন হচ্ছে তা বোঝানো হচ্ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৭.৩ শতাংশ পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে এলেও কর্মসংস্থান যতটুকু হচ্ছে তারও মাত্র ২৭ শতাংশ এসেছে এই ক্ষেত্র থেকে।

এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রীর দাবির সাথে বাস্তবের মিল নেই। মিল থাকতে পারে না। কারণ, পুঁজির অভাবের জন্য দেশের উন্নয়ন আটকে নেই। দেশে পুঁজির কোনও অভাব নেই। বরং পুঁজি উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত পুঁজির একটা অংশ অলস হয়ে পড়ে রয়েছে। বাকি একটা অংশ আফ্রিকা, এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে দীর্ঘ দিন ধরে খাটছে। এমনকী উন্নত অর্থনীতি বলে পরিচিত ব্রিটেন ইউরোপ আমেরিকাতেও ভারতীয় পুঁজি বিপুল পরিমাণে খাটছে। একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে এ দেশে যত পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি ভারতীয় পুঁজিপতিদের পুঁজি ব্রিটেনে বিনিয়োগ হয়েছে। এ দেশের পুঁজিপতিদের নাম এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের তালিকার একেবারে উপরের দিকে। অভাব যে জিনিসটার, যা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি, তা হল বাজার, যা আসলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, সেটাই দেশে দ্রুত হারে কমছে।

আর এটা কখনও হতে পারে না যে, বিদেশি পুঁজিপতিরা এ দেশে এসে উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে, আর দেশের উন্নয়ন তরতর করে ঘটতে থাকবে। এমন কখনও হয় না, কোথাও কোনও দেশে হয়নি। বরং যেখানেই বিদেশি পুঁজি যায়, তা সেখানকার সমস্ত সম্পদ তথা কাঁচামাল লুঠ করে এবং সস্তা শ্রমকে শোষণ করে। এর দ্বারা পুঁজিপতিরা বিপুল মুনাফা করে, কিন্তু সে দেশের মানুষের দুরবস্থা আরও বেড়ে যায়।

বিদেশি পুঁজিকে নির্বিচারে ছাড়পত্র দিলেই যদি অর্থনীতির অগ্রগতি হত তবে এই পথে নরসিমা রাও-মনমোহন সিং-রা পারলেন না কেন? দেশে দেশে পুঁজিপতিদের ঝানু পলিটিক্যাল ম্যানেজাররা কেউ পারছেন না কেন? পুঁজিপতিদের এ দেশে বিনিয়োগ করার ডাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদিই প্রথম দিচ্ছেন না। পঁচিশ বছর আগে একই রকম ভাবে বিদেশি পুঁজিপতিদের ডাক দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। তাঁরাই প্রথম দেশে বিশ্বায়নের নীতি চালু করেছিলেন। বলেছিলেন, শুধু পুঁজিপতিদের নয় দেশের সাধারণ মানুষও এই নীতির দ্বারা লাভবান হবে। বলেছিলেন, দশটা বছর অপেক্ষা করুন, এর সুফল সকলেই পাবেন। তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। একের পর এক সরকার বদল হয়েছে, মন্ত্রী বদল হয়েছে। সকলেই একই কথা শুনিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জন্য বেকারি আর মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া কিছুই জোটেনি। এই নীতির কার্যকারিতা নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তুললেই তাঁরা বলেছেন, ধৈর্য ধরুন। মেওয়া ঠিক ফলবে।

গত আড়াই দশকে মেওয়া যা ফলেছে তা দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্যই। ধনী হয়েছে আরও ধনী, গরিব তলিয়ে গেছে দারিদ্রের অতল গহ্বরে। এক শতাংশ এমন ধনী পরিবারের হাতেই এখন দেশের মোট সম্পদের ৪৯ শতাংশ। দেশের এই ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ গত ১৫ বছরে ১২ গুণ বেড়েছে, যা দিয়ে ভারতের মতো দুখানা দেশের সমস্ত দারিদ্র মুছে দেওয়া সম্ভব।

আমাদের মতো পুঁজিবাদী একটি দেশে সরকারের মন্ত্রীরা, আমলারা, সরকারি মদতপুষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং কলমচিরা যখন উন্নয়নের কথা বলেন, তখন তা দেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির উন্নয়নের অর্থেই বলেন। যখন তারা গ্রোথ বা বৃদ্ধির কথা বলেন, তখনও তারা পুঁজিপতিদের বৃদ্ধির নিরিখেই তা বিচার করেন। কখনও দেশের সাধারণ মানুষ, যারা জনসংখ্যার নিরানব্বই ভাগ, তাদের উন্নয়নের কথা ভেবে বলেন না। উন্নয়ন বলতে তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান কর্মসংস্থানের কথা বোঝান না, তাদের জীবনমানের উন্নয়নের কথা বোঝান না। প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন, দেশের উন্নয়নের রথের চাকা বনবন করে ঘুরছে, তাই তখন তা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির উন্নয়নই বোঝায়। সে রথে দেশের সাধারণ মানুষের জায়গা হয় না, বরং তথাকথিত উন্নয়নের এই রথ তাদের বুকের উপর দিয়েই চলে। তাই পুঁজিপতিদের পুঁজি যে সময়ে ১২ গুণ বাড়ে, তখন হাজারে হাজারে কর্মরত মানুষ ছাঁটাই হয়ে বেকারে পরিণত হন, পরিবার নিয়ে পথে বসেন, অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটান। লক্ষ লক্ষ তুলা, আখ, পাট, আলু, টমেটো, কমলালেবু, ধান চাষি আত্মহত্যা করে। অথচ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা, পুঁজিপতি শ্রেণির পরিচালিত সংবাদমাধ্যম পুঁজিপতিদের স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ তথা দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ হিসাবে চালায়। তাদের উন্নয়নকেই সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হিসাবে দেখায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী কথিত এই উন্নয়নের সাথে দেশের ৯৯ ভাগ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং সবসময়েই এটা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। দেশের প্রথম সারির বণিকসভা অ্যাসোচেমের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই বৈপরীত্য পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যখন তুঙ্গে উঠেছে, সেই একই সময়ে ৫০ লক্ষ কর্মরত মানুষ তাদের কাজ হারিয়েছে। কর্মসংস্থান যা সৃষ্টি হয়েছে তা নামমাত্র।

এ কথার উত্তরে পুঁজিপতিদের পেটোয়া অর্থনীতিবিদরা, বিশেষজ্ঞ নামধারীরা এবং তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলি সমস্বরে কোরাস তুলছে, সংস্কারে আরও গতি আনতে হবে— ঝোড়ো গতি। তার অভাবেই উন্নয়ন আটকে রয়েছে। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার নাকি এই গতি আনতে পারেনি। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাই বিকাশ পুরুষ আখ্যা দিয়ে নিয়ে এসেছিল নরেন্দ্র মোদিকে। তাদের চাপেই প্রধানমন্ত্রী ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশে দেশে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বিদেশে এবং এ দেশে পুঁজির শোষণের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে দিতে না পারলে তাঁর এই ম্যানেজারের চাকরি থাকবে না। পুঁজিপতিদের তেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো তিনি তথা তাঁর দল ক্ষমতার গদিতে বসেছিলেন। যেন কোনও একটি সরকারের, কোনও বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাটাই মুখ্য! যেন এই সমাজব্যবস্থাটা, এর পুঁজিবাদী কাঠামোটা, এর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র, এর বিরাট আর্থিক বৈষম্য, এ সব কিছু নয়। যেন এই ব্যবস্থাটিকে অটুট রেখেও যে কেউ চাইলে ইচ্ছামতো উন্নয়ন ঘটাতে পারে। পারে না। যদি পারত, তবে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত দেশগুলিতে মন্দা এমন স্থায়ী এবং মারাত্মক রূপ নিত না। আজ পুঁজিপতিদের চাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অর্থনীতিতে গতি আনার নামে নির্বিচারে আরও বেসরকারিকরণের এবং বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিচ্ছেন। এর দ্বারা মানুষের দুর্গতি আরও বাড়বে, মন্দা আরও গভীর হবে। পুঁজিবাদ আরও অধিক সংকটে পড়বে।

আজ এই ভয়ঙ্কর সংকট থেকে রেহাই পেতে হলে সংকটের যে মূল কারণ— মানুষের কেনার ক্ষমতা কমে যাওয়া, তাকে বাড়াতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া ঘোষণায় কিছুটা অনাস্থা প্রকাশ করে বলেছিলেন, মেক ইন ইন্ডিয়া নয়, চাই মেড ফর ইন্ডিয়া। অর্থাৎ উৎপাদন করতে হবে দেশের মানুষের জন্য। অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ চাই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক, তারা আজ ধুঁকছে। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ। ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউটে কোটি কোটি শ্রমিক কাজ হারিয়ে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। এই অবস্থায় কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্য কিনবে কে? শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি-উচ্চবিত্ত অংশের উপর নির্ভর করে ভারতের মতো একটা দেশের অর্থনীতি কখনও চাঙ্গা হতে পারে না। আবার শুধু বিদেশে রপ্তানির উপর নির্ভর করে কখনও একটা অর্থনীতি চলতে পারে না। চোখের সামনে রয়েছে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উদাহরণ। রপ্তানি নির্ভর এই দেশগুলির অনেকেই এক সময় এশিয়ান টাইগার বলে পরিচিত ছিল। তারা এখন ইঁদুরে পরিণত হয়েছে। রপ্তানি নির্ভর চীন মন্দার ধাক্কায় তীব্র বাজার সংকটে পড়েছে। গোটা বিশ্বঅর্থনীতিকেই ভয়ঙ্কর মন্দা গ্রাস করেছে। সব দেশের পুঁজিপতিরাই অন্য দেশে বাজার খুঁজছে। কোনও টোটকা, কোনও ফন্দি-ফিকির এর হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে এমন কোনও জাদুদণ্ড নেই, যার দ্বারা তিনি এই সংকট মোচন করে বাজারকে চাঙ্গা করে তুলবেন। পুঁজিবাদ আজ মৃত্যুশয্যায়। মানুষকে, সভ্যতাকে আর তার দেওয়ার কিছু নেই। বরং তার আয়ু যত দীর্ঘায়িত হবে ততই সে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হবে, আরও নিত্যনতুন সংকটের জন্ম দেবে। এই সংকটের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই নভেম্বর বিপ্লব ডাক দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের। সমাজতন্ত্রই পারে সমাজকে, সভ্যতাকে এই সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে। এ কথা ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবেও যেমন সত্য ছিল, আজও তা তেমনই সত্য। এই সত্য বরং আজ আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

জীবনাবসান

কমরেড অরুণকুমার ঘোষ দুরারোগ্য ক্যানসারে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০ নভেম্বর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১৯৭২ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পরিচালিত এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি দলের কাজকর্ম শুরু করেন। প্রথম জীবনে কলকাতার ৬৯ নং ওয়ার্ডে দলীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে এবং পরবর্তীকালে বালিগঞ্জ-পদ্মপুকুর এবং শেষ জীবনে ঢাকুরিয়া-কসবা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী হিসাবে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা নেন। বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কমরেড অরুণকুমার ঘোষ ছিলেন উদারমনা, নিঃস্বার্থ চরিত্রের অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। অল্পবয়সী কমরেডদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্নেহশীল পিতার মতো। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ, বহু মানুষকে তিনি নীরবে, আড়াল থেকে সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন কর্মী এবং যে দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হত সে দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁর সাংস্কৃতিক নৈতিক মান ছিল উন্নত স্তরের। কেন্দ্রীয় সরকারের যে দপ্তরে তিনি কাজ করতেন তা দুর্নীতির আখড়া হিসাবে সুবিদিত, কিন্তু দীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর সততা ছিল প্রশ্নাতীত। এজন্য তিনি সহকর্মীদের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি খুশিমনে দলের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতেন। অসহনীয় রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও শেষপর্যন্ত তিনি দলের কর্মসূচিতে নিজেকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দলের কর্মীরা হাসপাতালে যান। কমরেড অরুণকুমার ঘোষের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের পক্ষে ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা। তাঁর মরদেহে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস তপন রায়চৌধুরী ও মানব বেরা এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস সলিল চক্রবর্তী, অমিতাভ চ্যাটার্জী ও চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। কেওড়াতলা শ্মশানে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী শ্রদ্ধা জানান। পদ্মপুকুরে তাঁর বাসভবনে এবং কেওড়াতলা শ্মশানে দলীয় কর্মীরা ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সমবেত হন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড অরুণকুমার ঘোষ লাল সেলাম

কেশিয়াড়িতে গণকনভেনশন

খরায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ, খাজনা ও ঋণ মকুব সহ বিকল্প চাষের বীজ-সার-কীটনাশক-বিদ্যুৎ সহ সমস্ত উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহের দাবিতে ২৭ নভেম্বর বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি কৃষক-শ্রমিক ও গণসংগ্রাম কমিটি। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক স্নেহাশিস আইচ অভিযোগ করেন, ক্ষতিপূরণের টাকা আটকানোর জন্য সময়মতো খাজনার রসিদ না দেওয়ার দুরভিসন্ধি চলছে। আমন ধান (মোটা) ১৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে ক্রয়-বিক্রয় করা হবে বলে বিডিও আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুশান্ত জানা।

চীনে সমাজতন্ত্র নেই। জনগণ নরক যন্ত্রণায়

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং ইন্ডিয়া' সহ বিভিন্ন সংবাদসূত্র থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী চীনের শ্রমজীবী জনগণের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার, বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জীবনের দুর্গতির যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে যে কোনও মানুষই বিচলিত হবেন।

সংবাদসূত্রগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, চীনের হুনান প্রদেশের শাওয়াঙ কাউন্টির হুয়াংজিং গ্রামকে বলা হয় 'মাদারলেস ভিলেজ'— মাতৃহীন গ্রাম। এই গ্রামের ১৩২টি শিশু-কিশোর পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে গ্রামে আছে। এই গ্রামে বেশিরভাগ শিশুই তাদের মায়েরা কেমন ছিল তা স্মরণ করতে পারে না। গ্রামীণ এলাকার চীনের অন্যান্য গ্রামের মতো এই গ্রামের পুরুষেরা জীবিকার সন্ধানে শহর থেকে শহরে ঘুরছে। কাজের সন্ধানে আসা এই ধরনের শ্রমিকরা হল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার বা পরিযায়ী শ্রমিক। মাসের মধ্যে তো নয়ই, এমনকী বছরেও একবার বাড়ি ফিরতে পারে না এই শ্রমিকরা। এদের স্ত্রীরাও একইভাবে কাজের সন্ধানে চলে যায়। অনেকের স্ত্রী বিয়ে করে অন্য পুরুষের সাথে চলে যায়। বাড়িতে ফেলে যায় তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা কিশোর সন্তানদের। এই শিশু কিশোররা হয় বৃদ্ধ দাদু-দিদার কাছে, নতুবা প্রতিবেশীদের দয়ায় তাদের কাছে থাকতে বাধ্য হয়। এদেরকেই বলা হচ্ছে 'লেফ্‌ট-বিহাইন্ড চিলড্রেন'। অল চায়না উইমেন্স ফেডারেশনের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, সারা চীনে বাবা-মায়ের ছেড়ে যাওয়া ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু কিশোরের সংখ্যা ৬ কোটি ১০ লক্ষ। এদের পড়াশোনা সাধারণত প্রাথমিক স্তরেই শেষ হয়ে যায়। পড়াশোনায় সাহায্য করার কেউ থাকে না। এরা অনাদরে অবহেলায় বড় হয়ে ওঠে। এদের আচরণে দেখা যায় অস্বাভাবিক মানসিকতার প্রতিফলন। এরা শৈশব থেকে নানা মানসিক সমস্যা নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। দেখা যায় এদের একদল বিষাদগ্রস্ত, হতাশাচ্ছন্ন, হীনমন্যতার শিকার; আর একদল অস্থিরমতি, বেপরোয়া, অসামাজিক মানসিকতা সম্পন্ন। পরিত্যক্ত শিশুদের মধ্যে যারা মেয়ে তাদের প্রতিনিয়ত যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়। এই মেয়েদের অনেকেই পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। অনেকে বিক্রি হয়ে যায়, যার খবরটুকুও পর্যন্ত তাদের বাবা-মায়েরা রাখে না বা পায় না। এই হতভাগ্য শিশু-কিশোরদের অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।

বাবা-মায়ের ছেড়ে যাওয়া শিশু-কিশোরদের অনেকেই বিভিন্ন কারখানায় শিশু শ্রমিকের কাজ করে। চীনে শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। চীনে সামস্যাং-এর মতো বহুজাতিক সংস্থাও তাদের কারখানাতে অত্যন্ত কম মজুরিতে শিশু শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নেয়। কারখানায় কাজ করার সময়ে এদের অনেকে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। গুয়াঙঝৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড আছে এমন শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই পিতা-মাতার ছেড়ে যাওয়া শিশু-কিশোর।

প্রতিবেশীরা যখন এদের খাওয়াতে পারে না, তখন বেঁচে থাকার তাগিদে এরা ছোটে শহরের দিকে। বাবা-মায়ের ছেড়ে যাওয়া শিশুদের মধ্যে যারা বিকলাঙ্গ তারা ক্রিমিনালদের খপ্পরে পড়ে। ক্রিমিনালদের গ্যাং লিডার তাদের ভিক্ষাবৃত্তির কাজে লাগায়। তারা সকালবেলায় ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে শহরের জনবহুল একেক স্থানে এদের একেক জনকে ছেড়ে দেয়। তারপর সন্ধ্যার পর আবার ভ্যানে তুলে আস্তানায় ফিরিয়ে আনে। সংগৃহীত সমস্ত টাকা-পয়সা ক্রিমিনালরা নিয়ে নেয়। সামান্য খেতে দেয়। হতভাগ্যদের প্রতিবাদ করার কোনও উপায় থাকে না।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, অসহায় এই বিপুল সংখ্যক শিশুদের এমন দুর্গতির জন্য দায়ী কে?

এর উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের একটু চীনের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর মহান নেতা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়। কৃষিনির্ভর অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়। এর মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই চীন প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য চৌ এন লাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে চীন সরকার গ্রাম-শহর সর্বত্র প্রতিটি চীনা নাগরিকের বাসস্থান, কাজ, খাদ্য ও ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মেটানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকের নাম নথিভুক্ত করা হয়, যাতে প্রত্যেকের প্রয়োজন মতো উপরোক্ত জিনিসগুলি সরকার সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে পারে। এই নথিভুক্ত করানোর পদ্ধতি চীনে 'হুকৌ' বলে পরিচিত। সরকার পিপল্‌স কমিউন গড়ে তুলে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে যৌথ খামারে কৃষকদের কাজ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে থাকে। কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই সমস্ত দিক থেকে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলে। বাস্তবে প্রায় একঘরে থাকা অবস্থায় দেশের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনগণকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে প্রায় এককভাবে খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-কৃষি-শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে উন্নতির এক বিশেষ স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

১৯৪৯ সালে যখন কমিউনিস্টরা সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তখন সম্রাট, জমিদার, কম্প্রাডর পুঁজিপতি ও কিছু ব্যবসাদার ছাড়া চীনের বাকি অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই নিচু। তখন চীনে গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বছর। বিপ্লবের মাত্র ১১ বছরে ১৯৬০ সালে চীনের গড় আয়ু ৬০ বছরে পৌঁছে যায়। শিশু মৃত্যুর হারও কমে আসে। ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি দেশ থেকে বিদায় দেয় বিপ্লবী সরকার। ১৯৫২ সালে শান্তি সম্মেলনে চীনে গিয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন বাংলার সাহিত্যিক মনোজ বসু। তিনি তাঁর লেখা 'চীন দেখে এলাম' বইতে লিখেছেন, "তিনটে বছর আগেও, কী আর বলব, বিদেশি মানুষ রিক্সা করে যাচ্ছেন—ভিখারির দল পঙ্গপালের মতো ছুটত পিছু পিছু। এখন একটা ভিখারি খুঁজে বের করুন দিকি! এই রিক্সাওয়ালারাই কী কাণ্ড করত লোকের সঙ্গে! টানাটানি, মারামারি, একরকম বলে গাড়িতে তুলে শেষটা অন্য রকম কথা— বিশেষ করে বাইরের লোক হলে তো কোনও রক্ষে ছিল না। আজকের চীনে ভিখারি নেই, পতিতা নেই। হাজার হাজার বছরের সামাজিক পাপ ... ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সাফ-সাফাই।" এক কথায়, উন্নত জীবনধারার উপযোগী সমস্ত রসদ জোগানের ব্যবস্থা করে তদানীন্তন সরকার জনজীবনকে সমস্ত দিক থেকে নিরাপদ করে তুলেছিল। নতুন উন্নত এক জীবনের আস্বাদন দিতে পেরেছিল।

মাও সে তুং-এর জীবনাবসানের পর ১৯৭৮ সালে তেং শিয়াও পিং ক্ষমতা কবায়ত্ত করার পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে তছনছ করে দেশকে পুঁজিবাদের পথে নিয়ে যায়। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নীল নক্সা 'বিশ্বায়ন' নীতিকে পুরোপুরি কার্যকর করে। পরিষেবা সহ বেশিরভাগ সরকারি ব্যবস্থাকে ধনকুবেরদের হাতে তুলে দেয় যাতে তারা বিপুল মুনাফা লুঠ করতে পারে। বাজার অর্থনীতির উদারিকরণ নীতির ধাক্কায় পিপলস কমিউনগুলো ভেঙে যায়, যৌথ খামার বাতিল হয়ে যায়। কৃষকদের যতটুকু জমি ছিল সেগুলোর উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়ে। কাজের সন্ধানে দলে দলে মানুষকে গ্রাম ছাড়তে হয়। অন্যদিকে দেশি-বিদেশি শিল্পপতি গোষ্ঠীকে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিতে নানা নামে অসংখ্য 'সেজ' (স্পেশাল ইকনমিক জোন) গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। ১৯৮০ সালে গোয়াঙডং প্রদেশে স্পেশাল ইকনমিক জোন গড়ে তোলার জন্য আইন করে। ১৯৮৪ সালে সমুদ্র তীরবর্তী ১৪টি শহরে সেজের ভিত্তিতে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯২ সালের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ১৫ টি ফ্রি ট্রেড জোন, ৩২ টি স্টেট লেভেল ইকনমিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল জোন এবং ৫৩টি হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট জোন প্রভৃতি চালু করে। এই সমস্ত এলাকায় ধনকুবেরদের কারখানা গড়ে তোলা বা ব্যবসা করার জন্য ট্যাক্স ছাড়, শ্রম আইন শিথিল সহ সমস্ত রকম আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সুযোগ সুবিধাকে হাতিয়ার করে দেশি-বিদেশি ধনকুবেররা নানা ধরনের কারখানা খুলছে। তারা কেমিক্যাল, গারমেন্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি কারখানায়, বিশেষ করে হোটেল বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে। জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা এই ছিন্নমূল লোকগুলোকেই তারা নামমাত্র মজুরিতে, ১০/১২ ঘণ্টা কাজের শর্তে ঠিকা চুক্তিতে কাজে লাগাচ্ছে। এই 'মাইগ্রাণ্ট' শ্রমিকদের বেশিরভাগই হয় নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে, নতুবা গৃহকর্ম, সেল্‌সম্যান, হোটেলে কাজ করে। শিশু শ্রমিকরাও নামমাত্র পারিশ্রমিকে নানা ক্ষেত্রে কাজ করে। ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস-এর ২০১৪ সালের বার্ষিক সার্ভে অনুযায়ী সারা চীনে 'মাইগ্র্যান্ট' শ্রমিকের সংখ্যা ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ। ধনকুবেরদের শিল্পগুলির পরিবেশ এমনই কদর্য, যেখানে ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি বা নিরাপত্তা বিধি মানার বালাই নেই। পরিণতিতে শ্রমিকরা অসময়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে কর্মক্ষেত্রে ৬৮,০৬১ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। এদের রক্ত নিংড়ানো শ্রমের বিনিময়েই চীনের ধনকুবেররা ফুলেফেঁপে উঠেছে। আর্থিক দিক থেকে পুঁজিবাদী চীনের বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান দখলের নেপথ্য রহস্য এখানেই।

জীবিকার সন্ধানে শহরের দিকে আসা গ্রামীণ এই জনশক্তির পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে গেছে, গ্রামের শিকড়ও উপড়ে গেছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা শহরে এলেও তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শহরের নথিভুক্ত অধিবাসী হতে পারে না, শহরে তারা বহিরাগত হিসাবেই থাকে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অল্প পারিশ্রমিকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহে ব্যর্থতায় আর প্রতিদিন দীর্ঘ সময় হাড়ভাঙা খাটুনিতে এরা দ্রুত পরিশ্রম করার ক্ষমতা হারায়। ছাঁটাই হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন এদের ভিক্ষা করা ছাড়া বাঁচার পথ থাকে না। চীনে গুটিকয়েক পুঁজিপতির সম্পদ গগনচুম্বী হয়েছে, ঠিক বিপরীতক্রমে চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দুর্গতি বেড়েছে মাত্রাহীনভাবে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে সমাজজীবনে। চীনে দুর্নীতি, অপরাধমূলক কার্যকলাপ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা — যা ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসন কায়েমের পর পরিকল্পিতভাবে অবলুপ্ত করা হয়েছিল। তেং শিয়াও পিং-এর বদান্যতায় চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এসব আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের অনিবার্য পরিণতিতে চীনের সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ—খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-কাজ—পাওয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা চূড়ান্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া চীনের মানুষের এই নারকীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ নেই। এ জন্য তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শকে হাতিয়ার করে আবার বিপ্লবের পথেই যেতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

কর্ণাটকের গুলবর্গায় এআইডিএসও-র সম্মেলন

৭ নভেম্বর এ আই ডি এস ও-র নবম গুলবর্গা জেলা সম্মেলন কলাবুরাগি শহরের কানাড়া সংঘ হলে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড এইচ ভি দিবাকর। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মানের করুণ অবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর। কমরেড মল্লিনাথ সিঙেঘকে সভাপতি এবং কমরেড হানামন্থ এস এইচকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।

ছত্তিশগড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ

দলিত আদিবাসীদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বাড়তে থাকা আক্রমণের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ের দুরগে বামপন্থী পার্টি ও গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই, সিপিআই-এম এল (লিবারেশন), ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা এবং নব জনবাদী লোকমঞ্চ আয়োজিত ৪ নভেম্বরের এই যৌথ ধরনার পর রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের উদ্দেশে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে এই শ্বাসরোধী পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর দাবি জানানো হয়েছে।

পরীক্ষা ফি কমল বালুরঘাটে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটে জয়চাঁদ লাল প্রগতি বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের চাপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা থেকে কমে ২৫৫ টাকা হল। এই স্কুলে ২১ নভেম্বর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফর্ম ফিলআপ ছিল। ৩০০ টাকা লাগবে শুনে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী স্কুলে অনেক কম টাকাতেই ফর্ম ফিল আপ হচ্ছিল। ওই স্কুলের ডি এস ও কর্মী নয়ন তিরকি ও বিজয় দেবশর্মার আহ্বানে পরীক্ষার্থীরা ফি কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। আন্দোলনের জেরে ফর্ম ফিল আপ বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং ৪৫ টাকা ফি কমানোর সিদ্ধান্ত হয়।

পাশ ফেল চালু করার দাবিতে ব্যারিকেড ভাঙল ছাত্র-যুবরা

পাশ-ফেল চালু সহ নানা দাবিতে ২৬ নভেম্বর কলকাতায় ছাত্র-যুব আইন অমান্য

আর টালবাহানা নয়, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে, টেট এবং সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সকল বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এই দাবিতে এ আই ডি এস ও-এ আই ডি ওয়াই ও-র ডাকে ছাত্র-যুবদের দৃপ্ত মিছিল সশস্ত্র পুলিশের একের পর এক লোহার ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য করল ২৬ নভেম্বর কলকাতায়। পুলিশের আক্রমণে আহত হয়েছেন ২০ জন, ৫ জনের আঘাত গুরুতর।

এ দিন কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু করেন প্রায় চার হাজার ছাত্র-যুবক। তাঁদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ছিল ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে আইন অমান্য করা। কিন্তু মিছিল আটকাতে সকাল থেকেই ছিল পুলিশের সাজ সাজ রব। বিশাল ব্যারিকেড, জলকামান, টিয়ারগ্যাস, লাঠি, বন্দুকধারী শত-শত র‍্যাফ-পুলিশের মহড়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা যুদ্ধে চলেছে। মিছিল বা আইন অমান্যের মতো এইটুকু গণতান্ত্রিক অধিকারও তারা দিতে চায় না। আইন অমান্য করার কথা জানা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করার জন্য তারা একটিও গাড়ির ব্যবস্থা করেনি। পুলিশের প্রথম থেকেই পরিকল্পনা ছিল গ্রেপ্তার না করে লাঠিচার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে মিছিল আটকে লাঠি চালিয়েও মিছিলকারীদের তারা হঠাতে পারেনি। ছাত্র-যুবরা রাস্তাতেই বসে পড়ে অবস্থান শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে গ্রেপ্তার করার কথা ঘোষণা করা হয়। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কাকদ্বীপে নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে কনভেনশনে আন্দোলনের অঙ্গীকার

২০ নভেম্বর এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর গণধর্ষণ ও নির্মম হত্যাকে কেন্দ্র করে ফুঁসে উঠেছিলেন কাকদ্বীপের সাধারণ মানুষ। অভিযোগ

বক্তব্য রাখছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নিতে পুলিশের টালবাহানার প্রতিবাদে মৃতদেহ ঘিরে রেখে হাজার হাজার মানুষ পরদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তা অবরুদ্ধ হয় আরও বহু জায়গায়। ২৩ নভেম্বর কাকদ্বীপ জুড়ে পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক বনধ। নারী নিরাপত্তার এই বেহাল দশার বিরুদ্ধে মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদকে সংগঠিত রূপ দিতে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে কাকদ্বীপে গঠিত হল 'কাকদ্বীপ নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি', গত ২৯ নভেম্বর।

এদিন স্থানীয় নিউ মার্কেট হলের সভায় মৃত ছাত্রীর প্রতিকৃতির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করার শপথ নেন হাজারেরও বেশি মানুষ। এলাকার সাধারণ মানুষ ছাড়াও নিহত ছাত্রীর পরিজন ও তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র, বিশিষ্ট চিকিৎসক নূপুর নন্দী, অধ্যাপক তরুণ দাস, সারা বাংলা নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত, সিপিডিআরএস-এর সহসভাপতি বিমল জানা প্রমুখ।

নিহত ছাত্রীর স্কুলের শিক্ষক দিব্যেন্দু পুরকাইতকে সভাপতি ও এলাকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুখেন্দু গিরিকে সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, পুলিশ এখনও পর্যন্ত সমস্ত দোষীকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও শাসক দলের নির্দেশে আন্দোলনকারীদের উপর মিথ্যা মামলা চাপিয়েছে। সম্মেলন থেকে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি তোলা হয়।

২৩ নভেম্বর পাথরপ্রতিমার গোপালনগর ও ২৪ নভেম্বর দুর্বাচটিতে মৌন মিছিলে অংশ নেন দুই হাজারের বেশি মানুষ। সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এই মিছিলে অংশ নেন। প্রতিবাদ সভায় বহু মানুষ এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে সেজন্য সকলকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার কথা বলেন।

মদের ব্যবসা বন্ধ কর

একের পাতার পর

তা ছাড়া মফঃস্বল জেলাগুলির সমস্ত ঘটনা সংবাদে আসে না। কিন্তু যতটুকু ঘটনার সংবাদ ইতিমধ্যে এসেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। সম্প্রতি কাকদ্বীপেও কামদুনির নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা এ রাজ্যের কোথাও না কোথাও প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। এই রকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে আমরা মনে করি এ রাজ্যের শহর এবং মফঃস্বল এলাকায় রমরমিয়ে মদের ব্যবসা গজিয়ে উঠতে দেওয়া এবং দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিক ও পুলিশি প্রশ্রয় দান। এ-ও আপনি অবগত আছেন যে, বিষাক্ত মদ খেয়ে কত মানুষের জীবনহানি ঘটেছে, কত মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে, কত সংসার পথের ভিখারি হয়েছে। মাদকাসক্তির ফলে পারিবারিক অশান্তি ও বধূ নির্যাতন ক্রমাগত বাড়ছে। আরও উদ্বেগের বিষয় যে, একদল ছাত্রের মধ্যেও এই সর্বনাশা প্রবণতা বাড়ছে।

এই রকম একটা গুরুতর বিষয়ে ইতিপূর্বে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এবং পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারের কাছে মদের দোকান ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধ আমরা বার বার করেছি। কিন্তু রাজ্য কোষাগারের ঘাটতির অজুহাতে মদের দোকানের লাইসেন্স ঢালাওভাবে দেওয়া হয়েছে। এখন সময় এসেছে রাজ্যে মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কয়েকটি রাজ্যে মদের ব্যবসা আগেই বন্ধ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি বিহার সরকারও মদের ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের যুগে স্বদেশি আন্দোলনের নেতারাও মাদক দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন করেছিলেন। আপনার সরকারকে অবিলম্বে মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার পুনরায় অনুরোধ করছি।

আমডাঙায় রক্তদান শিবির

২১ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙায় 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার'-এর পরিচালনায় রক্তদান শিবিরে ৫৩ জন রক্তদান করেন। বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, বিধায়ক রফিকুর রহমান, প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা দুলাল চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, শিক্ষক যতীশ গোবিন্দ জানা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রক্তদাতা ও অন্যান্য সহযোগীদের ধন্যবাদ জানান ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সম্পাদক গৌতম বিশ্বাস।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনসংগ্রাম, তাঁর সাহিত্য-কাব্য-নাটক-সঙ্গীত মানবতাবাদী মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে আজও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নদীয়া জেলা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে 'স্মরণে মননে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান হয় ২৪ নভেম্বর। কলকাতা প্রেস ক্লাবে গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্র গবেষক সুনীলময় ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বারিদবরণ ঘোষ (সভাপতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), সুপর্ণ ঘোষ (দ্বিজেন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী), নূপুর ছন্দা ঘোষ (বিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্রগীতি শিল্পী), সুজাতা মজুমদার (বিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্রগীতি শিল্পী) প্রমুখ। আত্মীয়-স্বজনসহ সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের কিছু বিশিষ্ট মানুষের মূল্যায়ন, তাঁর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিছু রচনা, একটি প্রামাণ্য জীবনী, তাঁর কালানুক্রমিক জীবন বৃত্তান্ত ও বেশ কিছু আলোকচিত্র এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে বলে জানান কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য ও সম্পাদক তুহিন দে।

শিলিগুড়িতে অ্যাবেকার আইন অমান্যে পুলিশের লাঠিচার্জ

বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, এম ভি সি এ বাতিল এবং বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টস তদন্তের দাবিতে ১৯ নভেম্বর অ্যাবেকার নেতৃত্বে তিন শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক শিলিগুড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এস ডি ও কোর্ট চত্বরে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ শুরু করে। তাতে ৫ জন বিদ্যুৎগ্রাহক আহত হন। সমস্ত বিদ্যুৎগ্রাহক আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। জামিনে মুক্তি দিলে লাঠিচার্জের প্রতিবাদে গ্রাহকরা পথ অবরোধ করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল ও পীযূষকান্তি শর্মা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কুণাল বিশ্বাস, কাজল চক্রবর্তী, অমল রায় প্রমুখ।

সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণপরিষদ, এগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের মূল চরিত্র বদলায় না

ভি আই লেনিন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে লেনিনের 'রাষ্ট্র' নামক নিবন্ধটির প্রথম দুটি অংশ গত দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় শেষাংশ।

দাস ব্যবস্থা হোক বা সামন্তী ব্যবস্থা, কোনও ব্যবস্থাতেই মুষ্টিমেয় মানুষ দমন-পীড়ন ছাড়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অধীনে রাখতে পারত না। নিপীড়ন উৎখাত করার জন্য নিপীড়িত শ্রেণিগুলির ক্রমাগত প্রচেষ্টার অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইতিহাস পূর্ণ। দাস ব্যবস্থার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় বহু দশক ধরে চলতে থাকা দাসত্ব থেকে মুক্তিযুদ্ধের রেকর্ড। ঘটনাচক্রে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এখন 'স্পার্টাসিস্ট' নাম নিয়েছে— এটাই জার্মানির একমাত্র পার্টি যে সত্যসত্যই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এরা এই নাম গ্রহণ করেছে কারণ দু'হাজার বছর আগে দাসদের বিরাট বিরাট বিদ্রোহগুলির নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাতদের একজন হলেন স্পার্টাকাস। দাস ব্যবস্থার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আপাত সর্বশক্তিমান রোমান সাম্রাজ্যের ওপর স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সশস্ত্র এবং ঐক্যবদ্ধ বিশাল দাসবাহিনীর বিদ্রোহের আঘাত এসে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত তারা পরাজিত হয়, বন্দি করা হয় তাদের। তারা অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসে এই ধরনের বহু গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে আছে। আমি কেবল দাসতন্ত্রের যুগের সবচেয়ে বড় গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করেছি। তেমনই সামন্ততন্ত্রের সমগ্র যুগ ধরে ছড়িয়ে আছে ক্রমাগত চাষি অভ্যুত্থানের ঘটনা। যেমন, মধ্যযুগে জার্মানিতে জমিদার এবং ভূমিদাস এই দুই শ্রেণির সংগ্রাম বিশাল আকার ধারণ করেছিল এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়াতেও সামন্তী জমিদারদের বিরুদ্ধে বারংবার একই ধরনের কৃষক অভ্যুত্থানের কথা আপনারা সকলেই জানেন।

ভূস্বামীদের আবশ্যিকভাবেই একটি হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়েছিল, যাতে তারা শাসনব্যবস্থা বহাল রেখে ও নিজেদের ক্ষমতার উপর দখল রেখে, নিজেদের অধীনে এক বিরাট সংখ্যক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে কিছু আইন ও নিয়মনীতি মানতে তাদের বাধ্য করতে পারে। এই ধরনের সকল আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ভূমিদাস কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের শাসন করার ক্ষমতা বহাল রাখা। এই ছিল সামন্তী রাষ্ট্র, যা রাশিয়াতেই হোক অথবা যথেষ্ট পিছিয়ে থাকা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে আজও সামন্ততন্ত্র রয়েছে, সেখানেই হোক— রূপভেদে কোথাও ছিল তা প্রজাতান্ত্রিক অথবা কোথাও রাজতান্ত্রিক শাসন। রাষ্ট্রটা যেখানে রাজতান্ত্রিক সেখানে একজন ব্যক্তি কর্তৃক শাসনই ছিল স্বীকৃত, আর প্রজাতন্ত্রে ছিল কোনও না কোনও ভাবে জমিদার সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন স্বীকৃত। এই হল সামন্তী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রূপ। সামন্ততন্ত্রে সমাজ ছিল শ্রেণিবিভক্ত, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাস কৃষক পুরোপুরি নগণ্য মুষ্টিমেয় জমিদার বা জমির মালিকের অধীন ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি, পণ্য বিনিময়ের অগ্রগতিকে ঘিরে একটি নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। তা হল, পুঁজিপতি শ্রেণি। মধ্যযুগের শেষ দিকে আমেরিকা আবিষ্কারের পর যখন মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বেড়ে যায়, বিশ্ববাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সোনা এবং রূপা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণত হয়, যখন আর্থিক লেনদেনের ফলে ব্যক্তির পক্ষে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয়, তখন পুঁজির উদ্ভব ঘটে। সোনা এবং রূপা সারা বিশ্ব জুড়ে সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। জমিদার শ্রেণির অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমতে থাকে এবং পুঁজির অধিকারী নতুন শ্রেণির ক্ষমতা বাড়তে থাকে। সমাজের পুনর্গঠন এমনভাবে ঘটল যে, যাতে মনে হল, সকল নাগরিকই সমান, দাসপ্রভু এবং দাসদের পুরনো বিভাজন দূর হয়ে গেল, যে যত পুঁজিরই মালিক হোক না কেন আইনের চোখে সকলেই সমান বলে পরিগণিত হল। কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে জমির মালিক হোক, অথবা কারও ক্ষেত্রে নিজের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য আর কিছুই না থাকুক— আইনের চোখে সবাই সমান। আইন সকলকেই সমানভাবে রক্ষা করে; শ্রমক্ষমতা

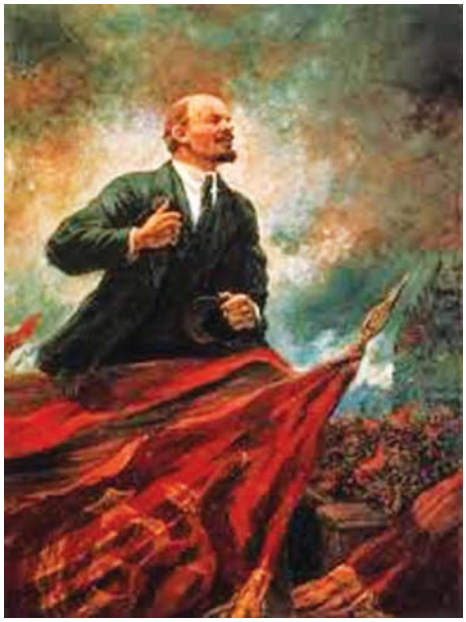

বিক্রি করা ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই, যারা ধীরে ধীরে নিঃস্ব, ধ্বংস হয়ে সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে তাদের আক্রমণ থেকে সম্পত্তির মালিকদের রক্ষা করে আইন। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ।

এ বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা আমি করব না। পার্টির কর্মসূচি যখন আপনারা আলোচনা করবেন তখন পুঁজিবাদী সমাজের বর্ণনা পাবেন। স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে এই সমাজ ভূমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়েছে, পুরনো সামন্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা বা লিবার্টি হচ্ছে যারা সম্পত্তির মালিক শুধু তাদের জন্যই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন সামন্ততন্ত্র ভাঙল, রাশিয়াতে ভেঙেছিল অন্যান্য দেশের পরে ১৮৬১ সালে, তখন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাতিল করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এল, এই রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতার স্লোগান দেয়, সকলের ইচ্ছাকে রূপায়িত করার কথা ঘোষণা করে এবং এটিও যে একটি শ্রেণিরাষ্ট্র তা অস্বীকার করে। এই পর্যায়ে সমাজতন্ত্রী, যারা সকল মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংগ্রাম দেখা দিল— যে সংগ্রামের পরিণতিতেই বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। এই সংগ্রাম সমস্ত বিশ্ব জুড়েই চলছে।

বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাকে বুঝতে হলে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সারমর্মকে বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সংগ্রাম শুরু করেছিল লিবার্টি বা স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে। সামন্ততন্ত্রের অবসানের অর্থ দাঁড়াল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের জন্য স্বাধীনতা। ভূমিদাস ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময় কৃষকরা জমির পুরো মালিক হওয়ার সুযোগ পেল; এই জমি তারা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্রয় করেছিল। সেটা যেভাবে ঘটে থাকুক না কেন, তা নিয়ে রাষ্ট্রের কোনও মাথাব্যথা ছিল না; সম্পত্তির উৎস যাই হোক না কেন, সম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ, কারণ, রাষ্ট্রটি ব্যক্তিসম্পত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সকল আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রে কৃষকরাই ব্যক্তিমালিক হয়ে গেল। এমনকী জমিদাররা যখন তাদের জমির খানিকটা কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে, তখনও রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তিকেই রক্ষা করেছে, ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণের টাকা বা জমি বিক্রির টাকা দিয়েছে। ব্যক্তিসম্পত্তিকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করবে বলে রাষ্ট্র শপথবদ্ধ এবং তদনুযায়ী সে ব্যক্তিসম্পত্তিকে সমর্থন এবং রক্ষা করবেই। রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কারখানা মালিকের সম্পত্তির অধিকারকে মর্যাদা দেয়। ব্যক্তিসম্পত্তি পুঁজির ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তিহীন কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে পুরোপুরি অধীনস্থ রাখার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ বলে যে, স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পুঁজিবাদ সম্পত্তির স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিল এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেন আর পূর্বেকার রাষ্ট্রের মতো একটি শ্রেণি রাষ্ট্র নেই— এ কথা ঘোষণা করতে বিশেষ গর্ব বোধ করেছিল।

তাদের এই ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে পুঁজিপতিরা যাতে গরিব চাষি এবং শ্রমিক শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখতে পারে এই রাষ্ট্রও সেই ধরনেরই একটি যন্ত্র। কিন্তু বাইরের দিক থেকে চেহারায় এই রাষ্ট্র মুক্ত বলে মনে হয়। এই রাষ্ট্র সার্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করেছে। পুঁজিবাদের ঘোর সমর্থক, প্রচারক, পুঁজিবাদী পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মাধ্যমে এরা ঘোষণা করায় যে, এটি শ্রেণি রাষ্ট্র নয়। এমনকী এখনও, যখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, তখন তারা অভিযোগ আনছে, আমরা নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করছি, দমনপীড়ন করার ভিত্তিতে নাকি আমরা রাষ্ট্র গড়ে তুলছি, এখানেও কিছু মানুষ অন্যদের দ্বারা অবদমিত হচ্ছে, আর তারা নাকি জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করছে। এখন যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব শুরু হয়েছে এবং কিছু দেশে তা সদ্য সফল হয়েছে, বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই বিশেষভাবে তীব্র হয়েছে তখন রাষ্ট্রের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কেউ এভাবেও বলতে পারে বর্তমানের সকল রাজনৈতিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু, সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

রাশিয়া সহ অন্য যে কোনও সভ্য দেশের দিকে যদি তাকাই তা হলে দেখব, সমস্ত দলের সকল বিরোধের মূল বিরোধ হল রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাকে কেন্দ্র করে। সুইজারল্যান্ড বা আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী দেশে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু আছে তা কি অবাধ গণতন্ত্র? তার মধ্যে কি জনগণের ইচ্ছার সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে? সেখানে কি জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখা যায়? নাকি রাষ্ট্র হল শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সম্প্রদায়ের উপর সে দেশের পুঁজিপতিদের শাসন বজায় রাখার যন্ত্র? বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক বিরোধ এই মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

বলশেভিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের মতামত কী? বুর্জোয়া সংবাদপত্র বলশেভিকদের সম্পর্কে নিন্দামন্দ করে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বারবার ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে বলে চলে যে, বলশেভিকরা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শাসন করে। যদি আমাদের মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা সরল হৃদয়ে (হয় এটা মোটেই সরলতা নয়, নয়ত তেমন সরলতা যা জটিলতার চেয়েও ভয়ঙ্কর) বিশ্বাস করে যে, বলশেভিকরা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে,— এসব অভিযোগ তাদের নিজেদের আবিষ্কার, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের বিরাট বিরাট ধনী সংবাদপত্র, যারা বুর্জোয়াদের তৈরি মিথ্যা প্রচার করার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করে লক্ষ লক্ষ কপি ছাপায় ও লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তা বণ্টন করে, তাদের কেউই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করতে ছাড়ে না। তারা বলে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশে জনগণের স্বার্থে শাসন পরিচালিত হয়, কিন্তু বলশেভিক রাষ্ট্র ডাকাত, তারা মানবাধিকারের তোয়াক্কা করে না। দেশ শাসন যে জনস্বার্থে করা উচিত— বলশেভিকরা এই ধারণা নিয়ে চলে না, তারা এতদূর নেমেছে যে, সংবিধান রচনার গণপরিষদ পর্যন্ত তারা ভেঙে দিয়েছে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অভিযোগ সারা দুনিয়ায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের জবাবে আমাদের বলতেই হচ্ছে— রাষ্ট্র কী? আমাদের দাঁড়াতে হবে দৃঢ় উপলব্ধির ওপর। অপরের মুখে ঝাল না খেয়ে, এই মিথ্যা অভিযোগের প্রকৃত জবাব কী, তা বুদ্ধিপূর্বক বুঝে নেওয়ার জন্যই আমাদের জানতে হবে— রাষ্ট্র কী? আমাদের সামনে রয়েছে নানা ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার সমর্থনে রয়েছে নানা কিসিমের তত্ত্ব যা মহাযুদ্ধের আগেই তৈরি হয়েছে। উত্থাপিত অভিযোগের সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য এই সব তত্ত্ব ও মতামত আমাদের খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

আগেই আমি আপনাদের বলেছি, এঙ্গেলসের 'দি অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট' বইটা পড়তে। সেই বইতে বলা আছে, যে রাষ্ট্রে জমি ও উৎপাদনের হাল হাতিয়ারের উপর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মেডিকেল কলেজে নার্সদের বিক্ষোভ

কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুই নবজাত শিশুর ওয়ার্মারের তাপে মৃত্যুর ঘটনায় শীর্ষ কর্তাদের বাদ দিয়ে বিনা তদন্তে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ৩ জন নার্সকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিবাদে ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার দাবিতে ২৮ নভেম্বর অধ্যক্ষের ঘরে পার্বতী পালের নেতৃত্বে নার্সেস ইউনিটির বিক্ষোভ

সরকারি কর্মচারীদের হেলথ স্কিম বিষয়ক আলোচনা ও পুস্তিকা প্রকাশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর কলকাতায় ভারতসভা হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হেলথ স্কিম বিষয়ক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা হেলথ স্কিম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং কর্মচারীদের নানা সমস্যা তুলে ধরেন। সুস্পষ্ট গাইড লাইন না থাকায় কর্মচারীরা যেমন নাজেহাল হচ্ছেন তেমনই বহু টাকা খরচ করার পর দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে নামমাত্র টাকা ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। ক্যাশলেস স্কিম হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালগুলি ভর্তি করিয়ে নেওয়ার পর চিকিৎসা খরচ মিটিয়ে দিতে বাধ্য করছে। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শুভাশিস দাস বলেন, স্কিমের সমস্ত কাজই বেসরকারি এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়ার সংস্থান ক্যাশলেস হেলথ স্কিমে রাখা হয়েছে। গভর্নমেন্ট অথরাইজড এজেন্সি (জিএএ) অর্থাৎ বেসরকারি এজেন্সির হাতে সমস্ত কাজ তুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সভার প্রধান অতিথি ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম অথরিটির প্রাক্তন আহ্বায়ক সদস্য মহম্মদ জহিরউদ্দিন মোল্লা 'হেলথ স্কিম' নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তিকার উদ্বোধন করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মধুসূদন ধর, সুনির্মল দাস, সন্তোষ মহন্ত, অসীম দাস। অন্যান্য সংগঠনগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতির সম্পাদক বানেশ্বর দাস, নার্সেস ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক পার্বতী পাল এবং জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন-এর সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক অনিন্দ্য রায় চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্রিয়াকলাপ

একের পাতার পর

আমির খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে তাঁর বক্তব্য বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তিকে মসীলিপ্ত করেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঠিক এর বিপরীত, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপই দেশের ভাবমূর্তিতে কালি দিয়েছে, দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করেছে এবং এই বাস্তবকে আড়াল করতেই তারা এখন আমির খানের বিবৃতি নিয়ে হই চই শুরু করেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ এবং আমির খান সহ লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গালিগালাজ — দুয়েরই আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এসব বন্ধ করার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। জনগণকে নিজেদের ঐক্যবদ্ধতাকে দৃঢ় করার ও ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী পরিবেশের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করার আবেদন জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রের মূল চরিত্র বদলায় না

পাঁচের পাতার পর

ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, যে রাষ্ট্রে পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, তা দেখতে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, তা হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের কাছে একটি হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা শ্রমিক শ্রেণি, গরিব চাষিদের নিজেদের অধীনস্থ করে রাখে। সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণপরিষদ, সংসদ এগুলি নিছক বহিরঙ্গের রূপ, অনেকটা প্রতিশ্রুতিপত্রের মতো, এর দ্বারা রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের কিছু রদবদল হয় না।

রাষ্ট্রের দমনমূলক বহিরঙ্গ রূপটা নানা রকম হতে পারে। পুঁজির রূপটা যেখানে একরকম সেখানে একভাবে তার ক্ষমতা প্রকট হতে পারে, যেখানে রূপটা অন্য রকম সেখানে তার ক্ষমতার প্রকাশটা ভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হল ক্ষমতাটা থাকে পুঁজির হাতে। সেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে কি না, প্রজাতন্ত্রের রূপটা গণতান্ত্রিক কি না এটা বড় কথা নয়। বরং যে রাষ্ট্র যত গণতান্ত্রিক সেখানে পুঁজিবাদী শাসনটা তত নগ্ন ও নির্লজ্জ রূপে ফুটে ওঠে। বিশ্বের সবচেয়ে উদার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সেখানে পুঁজির শাসন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির শাসন সবচেয়ে নগ্ন এবং খোলাখুলি দুর্নীতিতে সে দেশ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ১৯০৫ সালের পর যারাই সে দেশে গেছে তারাই এর সাক্ষ্য দেবে। একবার যে সমাজে পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সে গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র যাই হোক, সেই সমাজে ভোটাধিকারের প্রসার যতই ঘটানো হোক, তার দ্বারা মূল চরিত্রের বদল হয় না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বা সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন করা একটা বিরাট অগ্রগতি। কারণ গণতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকরা বর্তমান সংহতি ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম করে চলেছে। দাস সমাজের লড়াইয়ের কথা বাদই দিলাম, এমনকী ভূমিদাসদের লড়াইয়ের সঙ্গেও এর কোনও তুলনা হয় না।

আমরা জানি দাসেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছে, কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষকে শ্রেণিসচেতন পার্টিতে সংগঠিত করতে পারেনি— যে পার্টি লড়াই পরিচালনা করতে পারে। তাদের সামনে লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল না। তাই ইতিহাসের বহু বৈপ্লবিক মুহূর্তে দাসেরা সর্বদা শাসকদের হাতের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবসমাজের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, সংসদ, সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন ইত্যাদি অগ্রগতির পথে বড় পদক্ষেপ। মানবসমাজের অগ্রগতির পথেই এসেছে পুঁজিবাদ। একমাত্র পুঁজিবাদে এসেই শহর-সভ্যতার কল্যাণে শোষিত সর্বহারা নিজেকে চিনতে শিখেছে, নতুন সমাজ গড়ার কথা ভেবেছে, বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিয়ে গড়ে তুলেছে সর্বহারা পার্টি— সমাজতান্ত্রিক দল যারা জনগণের সংগ্রামকে সচেতনভাবে পরিচালিত করতে জানে। সংসদীয় ব্যবস্থা ছাড়া, নির্বাচনের ব্যবস্থা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির এই বিকাশ সম্ভব ছিল না। এই কারণেই ব্যাপক জনগণের দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই যে-কোনও প্রগতিশীল ব্যবস্থা অর্জন করা এত কঠিন। এজন্যই পাকা ঠগবাজরা শুধু নয়, বিজ্ঞানীরা, পুরোহিতেরাও বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রচারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে যে, রাষ্ট্র হল স্বাধীন এবং সকল জনগণের স্বার্থরক্ষাই তার লক্ষ্য। এই কারণেই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অন্তর থেকে পুরনো ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরনো পুঁজিবাদী সমাজের বদলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তাৎপর্য ধরতে পারে না। শুধু পুঁজি মালিকদের উপর নির্ভরশীল জনগণ নয়, পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট জনগণ যারা বা যারা পুঁজিপতিদের কাছে ঘুষ খেয়েছে (বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী, শিল্পী, পুরোহিত আছে যারা পুঁজির সেবায় নিযুক্ত)। শুধু তারা নয়, এমন লোকও আছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা যাঁদের কুসংস্কারের মতো পেয়ে বসেছে, এঁরা সবাই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই খড়্গহস্ত, তার কারণ প্রতিষ্ঠালগ্নেই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিয়ে বলেছে— তোমরা বল তোমাদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা অবাধ কিন্তু যতদিন ব্যক্তিসম্পত্তি থাকবে ততদিন তোমার এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটি যতই স্বাধীনতার বড়াই করুক তা শ্রমিকদের দমনের জন্য পুঁজিপতিদের হাতে হাতিয়ার, তার আপাত চেহারাটি যত অবাধ, ততই তার দমনমূলক চরিত্রটি প্রকট। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যতই পালিশ চড়িয়ে এদের সুন্দর করে দেখানো হোক, শ্রমিকের গণতন্ত্র, জনগণের সমানাধিকারের কথা যত জোর গলায় বলা হোক না কেন, ব্যাপক জনগণের ভালোমন্দের তোয়াক্কা না করে পুঁজির এমন নির্মম ও নির্লজ্জ শাসন দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। যদিও নামে এরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বাস্তব হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডে রয়েছে পুঁজির শাসন। এখানে শ্রমিক যদি তার জীবনমানের সামান্য উন্নতি ঘটানোর দাবি করে তা হলেই গৃহযুদ্ধ চাপানো হয়। এইসব দেশে সেনাবাহিনীতে লোক কম। সুইজারল্যান্ডে একটা মিলিশিয়া আছে, আবার প্রত্যেক সুইস নাগরিক ঘরে বন্দুক রাখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি সাম্প্রতিককালের আগে স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। তাই শ্রমিক আন্দোলন হলেই এখানকার বুর্জোয়ারা অস্ত্র সংগ্রহ করে, ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করে শ্রমিক আন্দোলন দমন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সুইজারল্যান্ডে যত নির্মমভাবে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হয় তেমনভাবে দুনিয়ায় আর কোথাও হয় না। আবার এখানকার সংসদে পুঁজির প্রভাব যত তীব্র তেমনটি দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। পুঁজি এখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, শেয়ারবাজার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদ, নির্বাচন এ সবই তাদের হাতের পুতুল। যদিও এখানকার শ্রমিকদের চোখ ক্রমশ খুলে যাচ্ছে। সম্প্রতি যে গণহত্যার পর্যায় আমরা পার হয়ে এলাম তারপর সোভিয়েট সরকারের ধারণা ক্রমশ ব্যাপকতর হচ্ছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালানো যে জরুরি তা শ্রমিক শ্রেণির কাছে দিনে দিনে স্পষ্ট হচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে ছদ্মবেশই ধারণ করুক, তা যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, তা যদি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়, যদি সেই রাষ্ট্রে জমি ও কলকারখানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা জারি থাকে, যদি সেই রাষ্ট্রে পুঁজি গোটা সমাজকে মজুরি-দাসত্বে বেঁধে রাখে, আমাদের দল ও সোভিয়েট সংবিধানে ঘোষিত নীতিগুলি যদি সেখানে কার্যকর না করা হয়, তবে সেই রাষ্ট্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় মানুষের আধিপত্য চাপিয়ে রাখার দমনমূলক হাতিয়ার। আমরা সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে এমন একটি শ্রেণির হাতে দেব যারা পুঁজির সর্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। সকলের জন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কাজ করে— এই মিথ্যাচারের আমরা অবসান ঘটাব। এটা প্রতারণা, কারণ যতদিন শোষণ থাকবে ততদিন সাম্য আসতে পারে না। শ্রমিক ও জমিদার কখনও সমান হতে পারে না, ভরপেট মানুষ ও ভুখা মানুষ কখনও সমান হতে পারে না। রাষ্ট্র সকল মানুষের জন্য— এই পুরনো গল্পে বিশ্বাস করে যে মানুষ ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে রাষ্ট্রের সামনে মাথা ঝোঁকাত, সর্বহারা সেই বুর্জোয়া মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেবে এবং রাষ্ট্রকে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। পুঁজিপতিদের হাত থেকে শোষণের সেই যন্ত্রটা আমরা কেড়ে নিয়েছি। এই যন্ত্রের আঘাতে আমরা শোষণকে চিরতরে বিনাশ করব। যেদিন দুনিয়ার কোথাও আর শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না, জমি বা কলকারখানার উপর ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না, যেদিন কেউ পেট ভরে খাবে আর কেউ ক্ষুধায় মরবে এই অবস্থা থাকবে না, যেদিন এসব সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হবে— সেদিন এই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে আমরা আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। সেদিন শোষণ থাকবে না, রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হবে। এইটিই কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। আমার মনে হয় পরবর্তী বক্তৃতায় আমি আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব এবং বার বারই আমাদের এই আলোচনায় ফিরে ফিরে আসতে হবে।

স্কুলছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না শিক্ষামন্ত্রী

ওদের কেউ ক্লাস সিক্সে পড়ে, কেউ সেভেন এইট বা নাইনে। ওরা মক পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করতে বিধানসভায় গিয়েছিল সম্প্রতি। রাজ্যের বেশকিছু মন্ত্রীও হাজির ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। নেহাতই ছোটোদের সাথে সময় কাটাবার নির্মল আনন্দ পেতে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ছোটো ছোটো 'অবুঝ' 'নির্বোধ'দের প্রশ্নে তাঁদের চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। এ কি বিরোধীদের কোনও চক্রান্ত?

কী ছিল ওদের প্রশ্ন?

মন্ত্রীদের সামনে পেয়ে ওরা প্রশ্ন করে বসেছে 'টাকা দিতে না পেরে স্কুলছুট হচ্ছে। আপনারা কি কিছু ভাবছেন?'

স্কুলছুট বন্ধের জন্যই নাকি পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে, তবু এখনও এত স্কুলছুট হচ্ছে?কেন যে হচ্ছে সে প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রীমশায়রা হয়ত জানেন না কিন্তু ওই ছোটো ছেলেমেয়েরা ঠিকই জানে। ওরা প্রশ্ন করেছে 'স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত অ্যাডমিশন ফি ২৪০ টাকা হলেও বহু স্কুলে এর থেকে বেশি টাকা নেওয়া হয় কেন? নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী জানালেন 'স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কোনও অফিসে কেউ এই বিষয়ে লিখিত জানায়নি। তবে আমি হাওড়ায় গিয়ে প্রথম এটা ধরেছি। যারা করছে শাস্তি দেব। ব্যবস্থা নেব। বিষয়টা তাহলে সরকার জানতই না! জানবেই বা কীভাবে? মন্ত্রীদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তো আর সরকারি স্কুলে পড়ে না। বেশিরভাগ সরকারি স্কুলের চিত্রটা তাঁদের না জানারই কথা। স্কুলছাত্ররাই তাঁদের জানালো, 'আমাদের ক্লাসে ১৯০ জন ছাত্র। কিন্তু শিক্ষক মোটে একজন।' আর একজন বলল 'আমাদের স্কুলে একটা ক্লাসে ৩৫০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক।'

প্রশ্নের উত্তর দিতে অন্যান্য মন্ত্রীরা যখন বেসামাল তখন আসরে নামলেন শিক্ষামন্ত্রী। ওদের প্রশ্নের উত্তরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাজের নানা সাফল্য, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের হরেক ফিরিস্তি পেশ করলেও প্রশ্ন থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিরস্ত করা গেল না। প্রশ্ন এল, 'আমাদের স্কুলে যে সরকারি বই দেওয়া হয় তা এমন সময় আসে যখন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আর সময় থাকে না। কেন এত দেরি?' ইটভাটা এলাকায় বহু জায়গায় আই সি ডি এস সেন্টার নেই। বহু জায়গায় এই সেন্টারগুলির ঠিকঠাক ঘর নেই, রান্নার ঠিকঠিক ব্যবস্থা নেই— কেন?' অস্বস্তিকর এইসব 'কেন'র উত্তর দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে আর সব মন্ত্রীরা যখন জেরবার তখন শিক্ষামন্ত্রী উপায়টা জব্বর বের করলেন। তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন সরকার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে জুতো দেবে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে জুতো দেওয়ার আশ্বাসটা কি খুব সমীচীন হল? ওরা তো কেউ জুতো চায়নি। ওরা ঠিক সময়ে বই পেতে চেয়েছিল, ক্লাসের ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক পেতে চেয়েছিল, সরকার নির্ধারিত ফিতে পড়তে চেয়েছিল- এগুলির কী হবে?

উত্তর কে দেবে জানা নেই, তবে এটুকু জানা গেল একে বলে শিক্ষার গোড়া মেরে জুতো দান।

একের পর এক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল

টিউবওয়েল বসবে গ্রামে। সরঞ্জাম জমা হচ্ছে রাস্তার পাশে। আগ্রহী জনতার ঘোরাফেরা। কিছুদিন পর দেখা গেল, সমস্তই উধাও। পঞ্চায়েত বা পুরসভার টাকা বরাদ্দও হয়েছে, কিন্তু টিউবওয়েল বসল না। এ দৃশ্য বহুজনেরই দেখা। শুধু কি টিউবওয়েল, সম্প্রতি গোটা রাস্তা উধাও হয়েছে শহর কলকাতার নিকটবর্তী এলাকায়। তৃণমূল পরিচালিত পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি রাস্তার জন্য ২৩ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে, কিন্তু রাস্তা তৈরি হয়নি।

শহরে গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য নাকি প্রতি বছর গড়ে সাড়ে তিন কোটি টাকার ওষুধ কিনেছে পুরসভা। কিন্তু পুরসভার মেডিকেল স্টোরের রেজিস্টার মেলাতে গিয়ে ক্যাগের (কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল) অডিটররা জানতে পেরেছেন, এক্সপায়ারি ডেট পার হওয়া বহু ওষুধ কেনা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালের পর থেকে ওষুধ কেনার জন্য কোনও টেন্ডার ডাকা হয়নি। ম্যানুফ্যাকচারারের বদলে সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে ওষুধ কেনা হয়েছে। বিনা টেন্ডারে ২৫ কোটির ওষুধ কেনায় হইচই পড়েছিল আগেই। তার তদন্তের নির্দেশ দেন স্বয়ং মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তারপরেও এ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার কোটি কোটি টাকার ওষুধ কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছেন পুরসভার স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ প্রদীপকুমার রায়চৌধুরী।

হোর্ডিং দুর্নীতির জেরে প্রায় ২৪ কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে। অভিযোগ, শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হোর্ডিং সংস্থাকে নিয়মবর্হিভূতভাবে সুবিধা পাইয়ে দিতে গিয়েই এই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে পুরসভা। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে মোট চারটি এজেন্সিকে হোর্ডিংয়ের বরাত দিয়েছিল পুরসভা। নিয়মানুযায়ী, বকেয়া টাকা জমা না দিলে কেউ টেন্ডারে অংশ নিতে পারে না। কিন্তু ঐ চারটি সংস্থা যাতে টেন্ডারে অংশ নিতে পারে, তার জন্য কম্পিউটার থেকে তাদের বকেয়া প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকার বিল মুছে ফেলা হয়েছিল। ঠিক ছিল, হোর্ডিংয়ের ভাড়া বাবদ এজেন্সিগুলি ক্লাস্টার পিছু মোট ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পুরসভাকে দেবে। কিন্তু সেই টাকা জমা করেনি সংস্থাগুলি। সেজন্য মোট ২৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা হাতছাড়া হয়েছে পুরসভার। (এই সময়- ৩।১১।১৫)। এর আগে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ত্রিফলা বাতি লাগানোকে কেন্দ্র করে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তার দায় মেটানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত করের টাকায়।

গ্রাম-শহরে এ রকম দুর্নীতির নমুনা অজস্র। এইসব দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কোনও শাস্তি নেই। তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অথচ তাদের নেতা-মন্ত্রীদের অনেকেই আজ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। নির্বাচনের সময় এইসব ভ্রষ্টাচারীদের নামের পাশে দেওয়ালে লেখা হবে— 'কাজের মানুষ', 'কাছের মানুষ'। জনগণের কর্তব্য হল, এদের এইসব 'কাজ' অবাধে চালিয়ে যেতে সাহায্য করা— ভোট দেওয়া! হায় রে গণতন্ত্র!

হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসা নিয়ে বিভ্রান্তি

রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে সরকার ঘোষিত ফ্রি চিকিৎসা সম্পর্কে উচ্চপদস্থ একাধিক স্বাস্থ্যকর্তার পরস্পরবিরোধী নির্দেশিকার জন্য ফ্রি পরিষেবা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বহু রোগী পকেটের টাকা খরচ করেও সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, পরিকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ না করেই তড়িঘড়ি চটকদারি রাজনীতির জন্য ফ্রি চিকিৎসার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার অনতিবিলম্বে পরিকাঠামো তৈরি করে, উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করুক এবং সঠিক ফিনান্সিয়াল গাইডলাইন দিয়ে ফ্রি চিকিৎসা এমনকী পি পি পি মডেলে পরিচালিত পরিষেবার ক্ষেত্রেও ফ্রি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুক। অন্যথায় ফ্রি চিকিৎসা বিঘ্নিত হওয়ার পেছনে এক শ্রেণির ডাক্তারদের হাত রয়েছে বলে সাফাই গাওয়া বন্ধ করুক। আর যদি কোনও চিকিৎসক এর জন্য দায়ী হয়ে থাকেন তাঁদের চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিনন্দন

আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ২৭ নভেম্বর ওই ব্যাঙ্কের অফিসার ও কর্মচারীরা দেশ জুড়ে সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট পালন করেন। এ জন্য তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা।

যেন শ্রান্ত কপালে স্নিগ্ধ বাতাসের ছোঁয়া

জরিমানার টাকা জোগাড় করতে না পেরে সাজার মেয়াদ ফুরানোর পরেও জেল থেকে বেরোতে পারছিলেন না জনা পনেরো মানুষ। 'পেটি কেস'-এর আসামী এঁরা। কেউ ধরা পড়েছিলেন বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে, কাউকে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এঁদের কথা শুনে এলাকার কয়েকজনের মনে হল কিছু করা দরকার। যে-ই ভাবা সে-ই কাজ। চাঁদা তুলে জোগাড় হল জরিমানার ৫০ হাজার টাকা। মুক্তি পেলেন বন্দিরা।

ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বারেলির। চারিদিকের এই আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজেরটা বুঝে নেওয়া স্বার্থপর সমাজে এই ধরনের ঘটনা এখনও শ্রান্ত কপালে স্নিগ্ধ বাতাসের ছোঁয়ার মতো। মন প্রসন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এর মাঝে যদি ধর্মের কথা উঠে আসে? পাঠককে যদি জানানো হয়, জেলবন্দি মানুষগুলি ছিলেন হিন্দু, আর যাঁরা এঁদের ছাড়িয়ে আনার জন্য মানুষের কাছে হাত পেতে টাকা জোগাড় করলেন, তাঁরা মুসলমান! হয়ত পাঠকের কপালে ভাঁজ পড়বে। কারণ পরিবেশে এখন মুসলমান বিদ্বেষের কটু গন্ধ। বাতাসে হানাহানির তীব্র ঝাঁঝ। এই সেদিন এই উত্তরপ্রদেশেরই দাদরিতে গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' ধর্মান্ধ জল্লাদদের হাতে খুন হতে হয়েছে একজন নিরীহ মানুষকে। দেশের যুক্তিবাদী শুভবুদ্ধিসমৃদ্ধ মানুষ ধর্ম-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মন্তব্য করলে, খেতাব ফেরালে সংঘ পরিবার-সদস্যদের একের পর এক হিংস্র মন্তব্যের ঢেউ সংবাদমাধ্যমে অনবরত আছড়ে পড়ে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ যে ধর্মের ভিত্তিতে একে অপরকে বিচার করেন না, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সময় বিপন্নের জাত বিচার করে দেখেন না, বারেলির ঘটনা তা আরও একবার প্রমাণ করল। প্রমাণ হয়ে গেল, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে, দাঙ্গা লাগায় ক্ষমতার রাজনীতির কারবারি ভোটলোভী মতলববাজরা। সাধারণ লোক তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়, শিকার বনে যায়। তখন রাস্তা ভিজে যায় মানুষের রক্তে, বাতাসে ভাসে মানুষের মাংস পোড়া গন্ধ। কান পাতলে শোনা যায় একে অপরকে লক্ষ করে দাঁতে দাঁত ঘষা বিষাক্ত উচ্চারণ — 'ওই ওরাই যত সর্বনাশের মূল...'।

জেলবন্দি নন্দকিশোর কিংবা প্রৌঢ় চিরৌঞ্জি লাল ও তাঁর স্ত্রী ওমবতীর মতো ১৫ জন মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আগে হাজি মহম্মদ আনিস কুরেশিদের মাথায় কিন্তু এসব চিন্তা জায়গা পায়নি। শুধু জেল থেকে বাইরে আনাই নয়, কুরেশি ও তাঁর বন্ধুরা গরিব নন্দকিশোরদের হাতে তুলে দিয়েছেন গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পাথেয়ও। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নন্দকিশোররা যখন প্রবল আবেগে কুরেশিদের জড়িয়ে ধরেছেন, কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁরা বলেছেন — এ আর এমন কী! আমরা মানুষের কর্তব্য করেছি মাত্র। বলেছেন, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এঁদের দুর্দশার কথা শুনে আমরা ঠিক করেছিলাম, পাশে দাঁড়াবো। কখনই ভাবিনি, শুধু নিজেদের ধর্মের মানুষকেই সাহায্য করব। কুরেশি বলেছেন, 'সাহেব, এই দেশ তো আমাদেরও মাতৃভূমি, হিন্দুরা আমাদের ভাই। এখানে জন্মেছি আমরা। মৃত্যুর পর দেহ তো এই মাটিতেই মিশবে!'

আজ যখন হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টদের হুঙ্কারে দেশের মাটি কেঁপে উঠছে, ভোট-রাজনীতির খেলোয়াড়রা নিদান দিচ্ছেন কোন ভারতবাসী এদেশে থাকবেন আর কারা সীমান্তের অন্য পারে, তখন বারেলির এই ঘটনা গাঢ় অন্ধকারে আলোর ঠিকানা দিয়ে যায়। ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের গণ্ডি ছাপিয়ে ওঠা মনুষ্যত্বের জয়গান গায়। আশা জাগায়।

রামঝোরা চা বাগানে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ

ডুয়ার্সে রামঝোরা হিন্দি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী অনিমা গোঁসাই ২২ নভেম্বর প্রাতকৃত্যের জন্য মাঠে গেলে দুষ্কৃতীরা তাকে অপহরণ করে। পরদিন সকালে ওই মাঠের পাশে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। চা-বাগানে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকরা। তারা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হয়। কিন্তু ঘটনার তিন দিন পরেও কোনও অপরাধী ধরা না পড়ায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কর্মী কমরেড সুভাষ চিকবরাইক এবং কমরেড বিক্রম গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে শতাধিক মহিলা ও পুরুষ বীরপাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান। ভারপ্রাপ্ত অফিসার দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে চাই মেহনতি মানুষের ঐক্য

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

(৯৮ তম মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর কলকাতার এসপ্ল্যানেডে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আহূত সভায় গৃহীত প্রস্তাব)

এই মহতী সভা অত্যন্ত ক্ষোভ, বিস্ময়, বেদনা ও তীব্র ঘৃণার সাথে মনে করে যে, আর এস এস, শিবসেনা এবং তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সরকার ও দলের মদতে যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে চলেছে তা এক কথায় সমাজ, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ। সারা দেশে প্রায় প্রতিদিনই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি যে সমস্ত অত্যন্ত ঘৃণ্য ঘটনা ও হত্যাকাণ্ড বেপরোয়াভাবে ঘটিয়ে চলেছে তার নিন্দা করার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয় বলে এই সভা মনে করে। এই সভা আরও মনে করে আর এস এস এবং তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় ভাবাবেগ বা দেশপ্রেম নয়, জনগণের ঐক্য ও সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণে বিভাজনের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা, যা তারা অতীতেও সংগঠিত করেছে এবং বর্তমানে বিজেপি সরকারের মদতে লাগামহীনভাবে করে চলেছে।

আর এস এস, বিজেপি এবং তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি দেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে নানা উস্কানিমূলক ষড়যন্ত্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অতি সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিতে দিল্লির কাছে দাদরিতে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। আর এস এস এবং বিজেপির প্ররোচনায় পৈশাচিক উন্মত্ততায় শুধুমাত্র গুজব রটিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা ও তার ২২ বছরের পুত্রকে জখম করেছে। উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে দাঙ্গা বাধাতে আর এস এস-এর একজন বোরখা পরে হিন্দুদের মন্দিরে গো-মাংস রাখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়েছে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, দ্বেষ, ঘৃণা, অবিশ্বাস ও দাঙ্গার বাতাবরণ গড়ে তোলার জমি শক্ত করতে আর এস এস, বিজেপি এবং ধর্মীয় হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী সংগঠনগুলি অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এই তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির মদতে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতারও অতি নগ্ন প্রকাশ ঘটছে। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এম এস কালবার্গি, কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকর ও গোবিন্দ পানসারে-র ঘৃণ্য ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সমাজের শুভবুদ্ধিকে বিচলিত করেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক সংঘ পরিবারের দোসর শিবসেনা ভারত-পাক সীমান্তে গুলি বর্ষণের অজুহাতে মুম্বই ও পুণেতে প্রখ্যাত পাকিস্তানি গজল গায়ক গুলাম আলির সংগীতানুষ্ঠান বাতিল করতে সংগঠকদের বাধ্য করেছে। মহারাষ্ট্রে পাকিস্তানের এক পূর্বতন মন্ত্রীর একটি বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে সুধীন্দ্র কুলকার্নির মুখে সংঘ পরিবারের কালি মাখিয়ে দেওয়া, এবং চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা গিরীশ কারনাড ও অভিনেতা শাহরুখ খানকে হুমকি দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি অত্যন্ত হীন ও ঘৃণ্য নজির গড়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এবং প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার। বরং এই ঘৃণ্য ঘটনার সাফাই গাইতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদী শক্তিগুলি এই ধরনের কার্যকলাপে সাহস ও শক্তি পাচ্ছে এবং একটার পর একটা এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা তারা ঘটিয়ে চলেছে। যদিও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক ও সংগঠনগুলি ক্ষোভে, ঘৃণায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এমনকি এই প্রতিবাদে সমাজের বিদ্বজ্জনরাও সামিল হয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যিক নয়নতারা সেহগল, উর্দু লেখক রহমান বিশ্বাস, কবি ও প্রাবন্ধিক অশোক বাজপেয়ী, হিন্দি সাহিত্যিক উদয় প্রকাশ, মালয়ালী ঔপন্যাসিক সারা জোসেফ, গুজরাটের লেখক গণেশ দেবী, দিল্লির লেখক আমন শেঠি, কর্ণাটকের কুম বীরভদ্রাপ্পা, পাঞ্জাবের গুরবচন ভুল্লার, অজমের সিং ঔলাখ এবং আত্মজিৎ সিং তাঁদের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ফেরত দিয়েছেন। ইংরেজি ভাষার ঔপন্যাসিক শশী দেশপাণ্ডে পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অ্যাকাডেমির জেনারেল কাউন্সিল থেকেও পদত্যাগ করেছেন। অ্যাকাডেমি জেনারেল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন গল্প লেখক পি এ পারাক্কাদাভু, কে এস রবিকুমার। এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে সমর্থন করেছেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক গোবিন্দ নিহালনি। এছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ পি এম ভার্গব সহ বহু বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং এই প্রতিবাদী কণ্ঠও ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এই সভা মৌলবাদীদের এই ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্বজ্জনদের প্রতিবাদকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই সভা মনে করে, বর্তমানে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ যত নির্মম আকার ধারণ করছে এবং সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদের সীমাহীন শোষণে যত জর্জরিত হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে মানুষ সামিল হচ্ছে, তা ধ্বংস করতে পুঁজিপতিশ্রেণি ষড়যন্ত্র করে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের বিভেদ ঘটিয়ে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করে মানুষে মানুষে হানাহানি সৃষ্টি করতে চাইছে এবং দেশব্যাপী দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। এ কাজে মৌলবাদী শক্তিগুলিকে সমানে তারা মদত দিয়ে চলেছে। এর আসল উদ্দেশ্য হল, জনসাধারণের উপর পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ আরও দীর্ঘায়িত করা।

এই সভা মনে করে, ধর্মাচরণের সাথে সাম্প্রদায়িকতার কোনও সম্পর্ক নেই, বরং সাম্প্রদায়িকতা ধর্মেরই মূল নীতির বিরোধী এবং এই সভা আরও মনে করে, সমস্ত রকম মৌলবাদই মানুষের শত্রু। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই মৌলবাদের হোতা এবং মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে উগ্র মৌলবাদী চিন্তাকে বিপজ্জনকভাবে মদত দিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদের জমিকে শক্তিশালী করছে।

এই সভা মনে করে, বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে যে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তা এক কথায় ভয়াবহ ও নজিরবিহীন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয়ের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দেশে দেশে সম্পদ লুণ্ঠন করতে বেপরোয়া দানবীয় আক্রমণ শাণিত করেছে। স্থানীয়ভাবে যুদ্ধ বাধাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদী সংগঠন গড়ে তুলছে, কোথাও মদত দিচ্ছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম মৌলবাদ বিভিন্ন দেশে নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে, শিশুদের হত্যা করছে, মা-বোনেদের ইজ্জত নিচ্ছে। সম্পদ লুণ্ঠন করছে ও ধ্বংস করছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে হাড়হিম করা হত্যালীলা সংগঠিত করল এবং বাংলাদেশে যেভাবে ব্লগার হত্যা করছে এই সভা তারও তীব্র নিন্দা করছে। এই সভা মনে করে, সমাজতান্ত্রিক শক্তির অনুপস্থিতি এবং দেশে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের উপযুক্ত শক্তি নিয়ে না গড়ে ওঠার ফলে সাম্রাজ্যবাদ এই ঘৃণ্য জাতিগত ধর্মীয় দাঙ্গা চালিয়ে যেতে পারছে।

এই সভা মনে করে, আজ দেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে সর্বত্র মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিজেপি ও তার সহযোগী শক্তিদের প্রত্যক্ষ মদতে ও সহযোগিতায় বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আচরণবিধি, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলবাদ যত বেশি আগ্রাসী হচ্ছে, তত সংখ্যালঘু মৌলবাদী শক্তিগুলিও সংহত হচ্ছে। এই সভা চিন্তাশীল যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক ও সমাজ সচেতন মানুষ এবং সর্বস্তরের জনগণকে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষবাষ্প থেকে সামাজিক পরিবেশকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

এই সভা মানব সভ্যতাকে রক্ষার প্রয়োজনে সমস্ত রকম মৌলবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিচ্ছে।

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ সেভ এডুকেশন কমিটির

বিলম্বে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথভাবে শিখছে না, কিছু না শিখেই উচ্চতর ক্লাসে উঠে যাচ্ছে। এটা স্বীকারের পর প্রত্যাশিত ছিল সরকার কাল বিলম্ব না করে পাশ-ফেল প্রথা কঠোরভাবে কার্যকর করবে। কিন্তু কোথায় কী? পাশ-ফেল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করেই চুপচাপ বসে রয়েছে। কবে পাশ-ফেল ফেরাবে তা নিয়ে রেখে দিয়েছে যথেষ্ট ধোঁয়াশা। এই অবস্থায় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি ২৩ নভেম্বর পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভের ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী মানুষ, ছাত্র-যুবক এই বিক্ষোভে সামিল হন।

এদিন রামলীলা ময়দান থেকে সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে যন্তরমন্তরে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দিল্লির জাকির হোসেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা। বক্তব্য রাখেন জে এন ইউ-এর অধ্যাপক এ কে রামকৃষ্ণান, দিল্লি ইউনিভার্সিটি টিচার্স ইউনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক নন্দিতা নারায়ণ, কর্ণাটক স্টেট ল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক জে এম পাতিল, আসামের অধ্যাপক পি মহাপাত্র, অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন, উত্তরপ্রদেশের অধ্যাপক ডঃ চন্দ্রভন যাদব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, মধ্যপ্রদেশের অধ্যাপক রামাবতার শর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের অধ্যাপক এন চন্দ্রশেখর সহ বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডঃ অনীশ কুমার রায়ের নেতৃত্বে সাধনা মিশ্র (বিহার), এস এইচ থিলাগড় (তামিলনাড়ু) প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে স্মারকলিপি পেশ করে। দাবিপত্রে পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন ছাড়াও শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org